ওয়েবিনার ২

প্রবন্ধ শিরোনাম: **পন্য ও সেবার মূল্য বৃদ্ধির অভিঘাতে ভোক্তা অধিকার**

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক: রাজেকউজ্জামান রতন, শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদের নেতা।

প্রতিটি মানুষই একজন ভোক্তা। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, লিঙ্গ বা বয়স যাই হোক না কেন পণ্য ব্যবহার বা ভোগ করা ছাড়া জীবন যাপন কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। একজন মানুষের সমগ্র জীবনে কতশত দ্রব্যের যে প্রয়োজন হয় তা হিসাব করা কঠিন। নিত্য নতুন দ্রব্য এবং নতুন নতুন প্রয়োজন সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। আর তাই মানুষের জীবন জড়িয়ে আছে অসংখ্য পণ্যের সাথে। সকালের চা খাওয়া থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, সুস্থ থেকে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যাওয়া পর্যন্ত, লেখাপড়া- কাজ কিংবা বিনোদন সব কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে নানা ধরণের পণ্য। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য দ্রব্য কখন পণ্য হয় ? যখন কোন দ্রব্যের বিনিময় মুল্য নির্ধারিত হয় তখন তা পণ্য হয়ে উঠে। নদীর পানি, প্রকৃতির বাতাস, গাছের ফল, ঘরের কাজ কোন কিছুই পণ্য নয়। কিন্তু যখন মানুষের শ্রমে তা ব্যবহার উপযোগী হয় বা তা দ্বারা কেউ সুফল পায় তখন যদি এ সবের বিনিময় মুল্য নির্ধারণ করা হয় তবে তা পণ্য হয়ে উঠে। সাধারণ অর্থে কোন কিছুর বিনিময় মুল্যকে দাম বলে। কোন বস্তুর উপর মানুষের শ্রম প্রয়োগ করা হলে তা ব্যবহার উপযোগী দ্রব্য হয় একে তখন দামের বিনিময়ে অন্য কেউ ভোগ করতে পারে।

পণ্য আবার নিত্য প্রয়োজনীয়, প্রয়োজনীয়, বিলাসী পণ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যেমন আছে তেমনি আবার ভোক্তার আয়ের স্থিতিস্থাপকতাও আছে। কিছু পণ্যের দাম বাড়লে ব্যবহার কমে আবার ভোক্তার আয় বাড়লে কিছু পণ্যের ব্যবহার বাড়ে। আবার কিছু পণ্য এতই প্রয়োজনীয় যে তার দাম বাড়লে বা দুস্প্রাপ্য হলে অন্য পণ্যের জন্য খরচ কমিয়ে সেই পণ্য ব্যবহার করতে হয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৭ কোটি । অর্থনৈতিক সামর্থ্য অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যা মোটা দাগে দরিদ্য, মধ্যবিত্ত আর ধনীতে বিভক্ত। আয় সবার এক রকম নয়, ব্যয় করার ইচ্ছা বা সামর্থ্যও সবার এক নয়। সাধারণ মানুষ তার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক সামর্থ্য দ্বারা আর ধনীরা তাদের সামর্থ্য দ্বারা ইচ্ছা তৈরি করে। সাধারণ মানুষের প্রয়োজন আর সামর্থ্যের পার্থক্য

রবীন্দ্রনাথের মনেও বেদনা জাগিয়েছিল। সমাজে সমাধানের পথ না দেখে তিনি বিধাতার কাছে বর চেয়ে লিখেছিলেন, "আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও। আমাদের পানিও আছে, পিপাসাও আছে। দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।" বাজারে থরে থরে সাজানো পণ্য আর অসংখ্য অক্ষম ক্রেতা দেখলে আজ রবীন্দ্রনাথ কি লিখতেন তা ধারণা করা কঠিন। তবে বিধাতার কাছে বর চাওয়ার পরিবর্তে সাধারণ মানুষের আয় বাড়ানো আর পণ্যের দাম কমানোর কথা বলাই যুক্তিসঙ্গত হতো তার কাছে নিশ্চয়ই।

কোন দেশের অর্থনীতি উৎপাদন ও ভোগ দুটোর উপরই নির্ভর করে। মানুষ যদি না কিনতে পারে তাহলে ভোগ করতে পারে না। তাতে আকাংখ্যা এবং প্রয়োজন থাকলেও অর্থনীতির ভাষায় চাহিদা তৈরি হবে না। ফলে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হয় না এবং অতি উৎপাদনের সংকট তৈরি হয়। এই অতি উৎপাদন কিন্তু প্রয়োজনের চাইতে অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদনের কারণে নয়। মানুষের কিনতে পারার অক্ষমতার কারণে পণ্য অবিক্রিত থাকে, তাই অতিরিক্ত মনে হয়। এর ফলে উৎপাদক উৎপাদন কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়। উৎপাদন কমালে শ্রমিক ছাঁটাই করতে হয় কারণ তখন শ্রমিকের প্রয়োজন কম হয়। শ্রমিক ছাঁটাই হলে বেকারত্ব বাড়ে এবং বেকারদের আবার ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। এ এক দুষ্ট চক্র। উৎপাদক পণ্য উৎপাদন করে তো মানুষের ভোগের জন্য। ভোগকে কৃত্রিমভাবে বাড়ানোর জন্য কত বিজ্ঞাপন, প্রলোভন চারিদিকে! কিন্তু মানুষের ভোগের প্রয়োজন ও ইচ্ছা প্রধানত নির্ভর করে ক্রয় ক্ষমতার উপর। একটা দেশের অর্থনীতি কতটা শক্তিশালী তা বুঝা যায় সে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার কতটা শক্তিশালী তা দেখে। আভ্যন্তরীণ বাজার আবার নির্ভর করে দেশের জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার উপর। সে কারনেই সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা রক্ষা করা ও বৃদ্ধি করা দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতার জন্যই প্রয়োজন।

বাংলাদেশ এক অর্থে শ্রমজীবী মানুষ ও কৃষকের দেশ। লেবার ফোরস সার্ভে অনুযায়ী দেশে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যা ৬ কোটি ৮২ লক্ষ। মোট শ্রমশক্তির ৮৮ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৬ কোটি শ্রমজীবীই আবার অনানুষ্ঠানিক খাতে কর্মরত যাদের চাকুরী, আয় কোন কিছুরই স্থায়িত্ব নাই।এর মধ্যে কৃষি কাজে যুক্ত মানুষ ২ কোটি ৮০ লক্ষের মত। সরকার অর্থ বিভাগ থেকে ১৪ অক্টোবর

জারি করা এক আদেশে দিন মজুরদের দৈনিক মজুরী পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন ও বিভাগীয় শহরে দৈনিক দক্ষ শ্রমিকের মজুরী হবে ৬০০ টাকা, অদক্ষ শ্রমিক সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৫৭৫ টাকা এবং বিভাগীয় শহরে ৫৫০ টাকা, এর বাইরে জেলা উপজেলায় এই মজুরির চেয়ে ৫০ টাকা কম নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমান বাজারদরে এই টাকায় জীবন নির্বাহ করা যে কত কঠিন তা দিনমজুরদের চেহারা দেখলে বুঝা যায়। কিন্তু যদি এই মজুরির চাইতেও কম কেউ পায় তাহলে তাদের জীবন কিভাবে চলে? দেশে বহু ধরণের কাজ ও পেশা থাকলেও শ্রম মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ৪৩ টি খাতের জন্য মজুরী বোর্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। যেখানে প্রতি ৫ বছর পর পর মজুরী পুনর্নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে। এটা যে কার্যকরী হয় না তা ২০১৩ সালের পর থেকে ৩৩ টি খাতের মজুরী পুনঃনির্ধারণ না করার ঘটনায় প্রমাণিত। শ্রম আইন অনুযায়ী মজুরির হার নির্ধারণের সুপারিশ করার ক্ষেত্রে মজুরীবোর্ড জীবন যাত্রার খরচ, জীবনযাত্রার মান, উৎপাদন ব্যয়, পণ্যমূল্য, ব্যবসায়িক দক্ষতা, মুদ্রাস্ফীতিরহার, দেশ এবং সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কারণসমূহ বিবেচনা করার কথা। বাস্তবে তা যে কতটা করে তা বিভিন্ন সেক্টরে মজুরি নির্ধারণ দেখলে বুঝতে অসুবিধা হয়না।যেমন –দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে বিবেচিত গার্মেন্টস, যেখানে ৪০লাখ শ্রমিক কর্মরত তাদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ করা হয়েছে ৮হাজার টাকা। এথেকে একথা সাধারণভাবে বলা যায় দেশের ৬কোটি মানুষের মাসিক আয় ১০হাজার টাকার নিচে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিবেচনায় ১০ শতাংশের মত মানুষ আছেন যাদেরকে ধনী এবং উচ্চবিত্ত বলা যায়। যাদের হাতে আছে দেশের মোট আয়ের ৪৬ শতাংশ। উচ্চ মধ্যবিত্ত ১৩ শতাংশের হাতে দেশের আয়ের ২১.৪৯ আয়, মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত ৩৭ শতাংশের হাতে ২৬ শতাংশ আয় এবং দরিদ্র মানুষ ৪০ শতাংশ, তাদের হাতে দেশের আয়ের ৭.৬৩ শতাংশ আছে বলে অর্থনীতি গবেষক আবুল বারাকাত পরিচালিত অর্থনৈতিক জরিপে বলা হয়েছে। উপরের স্তরের ধনী ও অতি ধনী ১০ শতাংশ বাদ দিলে বাকি ৯০ শতাংশ মানুষকে আমরা প্রধানত দেশীয় পণ্যের ও বাজারেরভোক্তা বলে চিহ্নিত করতে পারি। যাদের দৈনন্দিন জীবনে নিত্যপন্যের দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধি নানা ধরনের অভিঘাত তৈরি করে।

কর্মজীবী দরিদ্র যাদের মাসিক আয় ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা তাদের কথা বাদ দিয়ে, নিম্ন মধ্যবিত্তদের কথাও যদি ধরি, যাদের মাসিক গড় আয় ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা। স্বামী স্ত্রী দুই সন্তান নিয়ে তাদের সংসার পরিচালনা করার সর্বনিম্ন খরচ কত হতে পারে ? একটু হিসাব করে দেখা যাক ! দুই রুমের একটা বাসা ঢাকা শহরের মিরপুর, মোহাম্মদপুর, লালবাগ, শাহজাহানপুর এলাকায় যদি হয় তাহলে কমপক্ষে ১২ হাজার টাকা ভাড়া। মাসে ৫০ কেজি চাল, ১৫ কেজি আটা, ৫ লিটার তেল, দিনে এক টুকরা মাছ অথবা মাংস খেতে হলে মাসে ২০ কেজি, ৫ কেজি ডাল, ২ কেজি চিনি, কাঁচা বাজার, মশলা পাতিসহ মাসিক খরচ হিসেব করুন ! খুব কম করে হলেও মাসে অন্তত ১৫ হাজার টাকা। সন্তানের স্কুল, পড়াশুনা, কাপড় চোপড়, ডাক্তার ওষুধ, অফিসে যাওয়া আসা, আত্মীয় স্বজনের বাড়ি যাওয়া, টেলিফোন খরচ, টেলিভিশন লাইন চার্জসহ আনুষঙ্গিক খরচ কিভাবে মেটানো সম্ভব? এর উপর যদি বিদ্যুৎ বিল, পানির বিল, গ্যাসের দাম, পরিবহণ ভাড়া বাড়তে থাকে তাহলে মানসম্মত জীবন যাপন তো দুরের কথা কোনমতে বেঁচে থাকাই তো কঠিন হয়ে পরে।

তারপরও তো মানুষ বেঁচে আছে ! তবে এটা কোন যাদু মন্ত্রে নয়, নিজেদের জীবনকে নিংড়ে নিয়ে। খাবারের খরচ সহ যেখানে সম্ভব সেখানেই ব্যয় সংকোচ করা ছাড়া আর কি কোন উপায় আছে? প্রথম সংকোচন আসে খাদ্যে। সাধারনত খাদ্য পণ্য হলো – ভাত, রুটি, ডিম, সব্জি, চা, মাছ, মাংস, তেল, চিনি, লবন, ফল ইত্যাদি। শক্তি উৎপাদন, পেশি গঠন, ক্ষয়পূরণ বিবেচনা করে খাদ্যকে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট এই তিন বিভাগে ফেলা হয়। সাধারনত সুষম খাদ্য হতে হলে কার্বোহাইড্রেট ৫৫%, প্রোটিন ৩০% ও ফ্যাট ১৫% অনুপাতে থাকতে হয়। এ ছাড়াও পানি, ভিটামিন ও মিনারেল এই তিন ধরণের সহ মোট ৬ ধরণের খাবার প্রয়োজন সুস্থতার জন্য। এ কথা জানা থাকলেও তা মেনে চলা অর্থনৈতিক কারণে অধিকাংশের পক্ষে সম্ভব হয় না। এর প্রভাব ব্যক্তিগত জীবনে কি ধরণের হয়? পুষ্টির অভাব কর্মক্ষমতা ও মানসিক ধৈর্য কমিয়ে দেয়। সংসারে অপুষ্টির সবচেয়ে বেশি প্রভাব পরে নারীর শরীরে ও মনে। নারীর শারীরিক অপুষ্টি ও মানসিক অনিশ্চয়তার ভয়ংকর প্রভাব পরে শিশুর জীবনে। শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য ডিম এবং দুধের প্রয়োজন কোন পুষ্টিবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ অস্বীকার করবেন না।কিন্তু অভিভাবকের তো ইচ্ছা থাকলেও উপায় সীমিত। অভিভাবকের

আয়ের উপর ব্যয় বৃদ্ধির প্রভাব শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত করে। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তার শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ।

অতি ধনী, ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত মিলে ২৩ শতাংশ বাদ দিলে বাকি ৭৭ শতাংশ মানুষের জীবনে নিত্যপন্যের মুল্যবৃদ্ধি দুশ্চিন্তার সাথে পারিবারিক ব্যয় প্রক্রিয়াকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে। গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানির মত পণ্য যা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, সেসবের মুল্য বৃদ্ধির পিছনে যতটা উৎপাদন ব্যয় তার চেয়ে বেশি দুর্নীতি, অপচয় ও রাষ্ট্রীয় নীতি যুক্ত। মুল্যবৃদ্ধির কারণে যদি মাসিক ব্যয় ৩০০ টাকা বৃদ্ধি পায় তাহলে তাঁরা কি করবেন? প্রথমে কমিয়ে দেবেন খাওয়ার খরচ। চাল, ডাল, তেল, চিনি, শিশু খাদ্য, ওষুধ, পরিবহণ ভাড়া ইত্যাদি যেসবের মূল্যবৃদ্ধি সিন্ডিকেট করে পরিকল্পিতভাবে বাড়ানো হয় তা ৭৭ শতাংশ মানুষের জীবনে মারাত্মক প্রভাব ফেলে। চালের দাম কেজিতে ১০ টাকা বাড়ালে, তেল লিটারে ১৫ টাকা বাড়লে, ওষুধের দাম নিয়মিতভাবে বাড়তে থাকলে একটি পরিবারের মাসিক ব্যয় যদি ১০০০ টাকা বৃদ্ধি পায় তাহলে তার প্রভাব শুধু খাদ্য নয় জীবনের অন্যান্য অংশেও পড়তে বাধ্য। ভোক্তা প্রথমে কমাবেন খাদ্যের খরচ, তারপর পোশাক, চিকিৎসা, সন্তানের লেখাপড়া এরপর বাসা পরিবর্তন করা এভাবেই চলতে থাকে প্রয়োজন কমানোর চেষ্টা। যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হয়, তারপর কি করবেন? উত্তর হবে, জানিনা । করোনার প্রথম আঘাতের সময় আয় রোজগার না থাকায় দলে দলে ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার চিত্র আমরা দেখেছি। একজনের অসহায় আর্তনাদ এখনও কানে বাজে। ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার সময় বলেছিল, ৫০ বছর ঢাকায় থাকলাম, তবুও ঢাকা আপন হইলো না !

এতো গেল ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাবের কথা। সামগ্রিক অর্থনীতিতে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব কি ঘটে না? বাংলাদেশেবছরে ৩ কোটি টন খাদ্য চাহিদা ধরলে দিনে ৮০ হাজার টন চাল প্রয়োজন। এর মধ্যে ৩০ হাজার টন কৃষক নিজের উৎপাদিত চাল নিজেই ভোগ করে, বাকি ৫০ হাজার টন চাল ব্যবসায়ীদের দ্বারা বাজারে বিক্রি হয়। প্রতি কেজিতে ১০ টাকা চালের দাম বৃদ্ধি হলে দিনে ৫০ কোটি টাকা ভোক্তার পকেট থেকে বাড়তি চলে যায়। এর বার্ষিক পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮ হাজার কোটি টাকার বেশি। এভাবে ১৮ লাখ টন চিনি, ১২ লাখ টন ভোজ্য তেল, ১৫ হাজার কোটি টাকার বেশি ওষুধের বাজারে মুল্য বাড়ানোর কারণে কি পরিমাণ টাকা জনগণের পকেট থেকে বেরিয়ে যায় তা বুঝতে পারা যায় মানুষের জীবনের অস্থিরতা, অসহায়ত্ব আর

ক্রমাগত ধনীদের সম্পদ বৃদ্ধি দেখে। ১৯৭২ সালে যে দেশ যাত্রা শুরু করেছিল ৫ জন কোটিপতি নিয়ে সে দেশে এখন লক্ষাধিক কোটিপতি। এই করোনাকালেও কোটিপতি বৃদ্ধি থামেনি। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেবে নতুন কোটিপতি জন্মেছে ১০ হাজার ৫০ জন। তাদের মধ্যে ১১৪ জনের টাকার পরিমাণ বেড়েছে গড়ে ৫০ কোটি টাকার বেশি। ১০ হাজারের বেশি ধনী এবার কালো টাকা সাদা করেছে। এ তো গেল ব্যাংকের বা এনবিআর এর দেয়া হিসাব। এর বাইরে আলমারি, সিন্দুক বা বালিশের নিচে যে টাকা আছে তার হিসাব পাওয়া তো কঠিন। মাঝে মাঝে পত্রিকায় খবর দেখে বিস্মিত হওয়া ছাড়া আর কিছু করার উপায় থাকে না। এই টাকার উৎস কি? কারা আবার বিভিন্ন পর্যায়ের ভোক্তা জনগণ। কারণ দুর্নীতি, চাঁদাবাজি বা মূল্যবৃদ্ধির যত কারনই থাকুক না কেন, শেষ পর্যন্ত সবকিছুর তাঁরাই তো ভুক্তভোগী।

আভ্যন্তরীণ বাজারে নিত্যপন্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব আরও জটিল। ১৭ কোটি জনসংখ্যার ৭৭ শতাংশ অর্থাৎ ১৩ কোটি দরিদ্র্য ও মধ্যবিত্ত যারা দেশীয় বাজারের পণ্যের প্রধান ক্রেতা। তাঁরা যদি ক্রয়ক্ষমতা হারায় তাহলে বাজারে এর প্রভাব পরে ভীষণ। ১৩ কোটি মানুষ বছরে এক জোড়া জুতা স্যান্ডেল ১০০০ টাকায় কিনলে দেশে ১৩ হাজার কোটি টাকার জুতার বাজার তৈরি হয়। ধনীরা কেনে দামী এবং বিদেশী জুতা, সেসব জুতা কেনার টাকা চলে যায় দেশের বাইরে। এ ছাড়া দেশে তৈরি লুঙ্গি, গামছা, শাড়ি, গৃহস্থালি পণ্য সামগ্রী সব কিছুর ক্রেতাই তো মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, দরিদ্র্য মানুষেরা। ফলে খাদ্য, জ্বালানী, ওষুধের জন্য ব্যয় বাড়লে তাঁরা অবধারিতভাবে খরচ কমাতে বাধ্য হবে খাদ্য, পোশাক পরিচ্ছদ, সন্তানের শিক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসায়। আর তার ফলে নিম্নমানের শিক্ষা এবং চিকিৎসার সুদূরপ্রসারী কুফল ভোগ করতে হবে দেশবাসীকে। কিন্তু যারা কানাডা, ইউরোপ, আমেরিকায় নিজের ও সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্মাণ করেছেন মূল্যবৃদ্ধি ও বাজার সংকটে তাদের অবশ্য কিছু আসবে যাবে না।

তাহলে রাষ্ট্র কি করবে ? শুধু কি জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতেই সন্তুষ্ট থাকবে? বৈষম্য বাড়ছে, ক্রয়ক্ষমতা কমছে এসব কি দেখবে না? সাধারণ মানুষ যারা উৎপাদন করে, যারা দেশের উৎপাদিত দ্রব্যের প্রধান ভোক্তা তাদের স্বার্থ দেখবে না? দরিদ্র্য মানুষ যদি খাদ্যপণ্যের জন্যে তার আয়ের ৬০ শতাংশের বেশি ব্যয় করতে বাধ্য হয়, মধ্যবিত্তরা যদি ৫০ শতাংশ ব্যয় করে খাদ্যপন্যের জন্য তাহলে জীবনের অন্যান্য প্রয়োজন

তাঁরা মেটাবে কিভাবে? বাংলাদেশে চিকিৎসা ব্যয়ের ৭৩.৮৭ ভাগ ব্যয় জনগণ করে নিজেদের পকেট থেকে। অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরিক্ষা, ওষুধের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি সহ চিকিৎসা ব্যয় বৃদ্ধির কারণে কত মানুষ যে দরিদ্রের কাতারে নেমে যাচ্ছে তা অনুমান করা কঠিন নয়। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে শিক্ষার খরচ, বাড়ি ভাড়া ও পরিবহণ খরচ। এসব মিটিয়ে মানুষের হাতে টাকা থাকার কোন উপায় কি আছে? মানুষের হাতে টাকা না থাকলে ক্রয় ক্ষমতা বাড়বে না। তাহলে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার ও কর্মসংস্থান বাড়বে কি ভাবে? প্রতিবছর শ্রমের বাজারে আসছে ২২ লাখ নতুন শ্রমশক্তি তাদের কাজের সংস্থান, উৎপাদন ও উন্নয়নকে তো একসাথেই দেখতে হবে। এটা করতে হলে দ্রব্যমুল্যে বৃদ্ধির অন্যায় আঘাত থেকে মানুষকে বাঁচাতেই হবে। এর জন্য প্রয়োজন বিএডিসি কে শক্তিশালী করে কৃষি উপকরণ সহজে ও স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করা, টিসিবি কে শক্তিশালী ও কার্যকর করে বাজার দস্যুদের হাত থেকে ক্রেতাকে রেহাই দেয়া, দেশব্যাপী রেশন ব্যবস্থা চালু করা, এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন এর গণশুনানিকে কার্যকর করা,ব্যবসায়িক সিন্ডিকেটগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা, নিয়মিত বাজার মনিটরিং করা, পরিবহণ ভাড়া যৌক্তিক করার উদ্যোগ নেয়া, শিক্ষা ব্যয়কে সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করা, চিকিৎসা ব্যয় ও ওষুধের বাজার নিয়ন্ত্রণ করা। নিত্য প্রয়োজনীয়পন্যমুল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় ভোক্তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ও তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া সহ ভোক্তা অধিকারকে কাগুজে ঘোষণা থেকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার পদক্ষেপ নেয়া দরকার। তাহলে ভোক্তা বাঁচবে মূল্যবৃদ্ধির আঘাত থেকে, ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে বাজার সম্প্রসারিত হবে, শিক্ষা চিকিৎসার মান বাড়বে এবং সাধারণ মানুষের জীবন অনেকখানি সহজ হয়ে উঠবে। এ কাজ করতে যত দেরি হবে ততই বৈষম্য বাড়তে থাকবে। মানুষের অসুখ থাকবে, চিকিৎসার প্রয়োজন থাকবে কিন্তু মানুষ তা গ্রহণ করতে পারবে না। প্রচুর কর্মহীন মানুষ থাকবে তাদের কাজের সংস্থান হবে না। দোকানে পণ্য থাকলেও মানুষ তা কিনতে পারবে না। এর সামগ্রিক প্রভাবে উন্নয়ন অসমতা প্রকট এবং সামাজিক অস্থিরতা ও নৈরাজ্যের কবলে পড়বে দেশ। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে হলে মূল্যবৃদ্ধির আঘাত থেকে জনগণকে বাঁচাতেই হবে।